101/ DC-1

BNGH SEMESTER - 1

শাক্ত পদাবলীর পরিচয়

অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই সমগ্র গৌড়বঙ্গ জুড়ে দেখা দিয়েছিল অমানিশার অন্ধকার। মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে দেশে মোটামুটিভাবে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল অব্যাহত , ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তা ' হল অন্তর্হিত বাংলার সমাজ-জীবনেও তখন বিপর্যস্ত অবস্থা , চৈতন্যদেবের প্রভাব ক্রমবিলুপ্তির পথে। বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম সহজিয়া পন্থা অবলম্বন করে যে তৎকালিক রূপ লাভ করেছিল , সমাজের শিষ্ট সম্প্রদায় তাকে 'ন্যাড়ানেড়ির' কাণ্ড বলে তা থেকে শতহস্ত দূরে সরে গিয়েছিলেন। দেশের এই সামূহিক অবক্ষয়ের যুগে আলোকবর্তিকা হাতে দেখা দিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ শাক্ত সাধনার একটি উচ্চস্তরে আরোহণ কাঁরে তিনি রচনা করলেন কিছু সাধনসঙ্গীত —একালে আমরা এগুলিকেই 'শাক্তপদাবলী' নামে অভিহিত ক'রে থাকি।

প্রাক্-চৈতন্য যুগেই আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছিল বৈষ্ণব পদাবলী '। আদি বৈষ্ণবপদকর্তা জয়দেব গোস্বামী তাঁর 'গীতগোবিন্দে'র রচনাকে 'পদ' নামে অভিহিত করায় পরবর্তীকালে রচিত অনুরূপ রচনাকে 'বৈষ্ণবপদ' নামেই পরিচায়িত করা হতো। রামপ্রসাদ-কর্তৃক প্রবর্তিত দেবী-বিষয়ক গানগুলিকে একালে আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর সাদৃশ্যে 'শাক্তপদাবলী' নামে অভিহিত করে থাকি। কিন্তু বিভিন্ন কালে এই গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত ছিল। এ জাতীয় গানগুলি প্রধানত রামপ্রসাদ-রচিত অথবা তার অনুসরণে রচিত বলে এগুলিকে 'রামপ্রসাদী গান' বা 'প্রসাদী সঙ্গীত' নামেও অভিহিত করা হয়। আবার সঙ্গীতের প্রধান বিষয় 'শ্যামা' বা 'কালী' বলে এর নামান্তর 'শ্যামাসঙ্গীত' ও 'কালীকীর্তন'। চর্যাপদে এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে 'মালসী' (মালবশ্রী রাগিণীর উল্লেখ আছে, কেউ কেউ ভবানী বিষয়ক গানকেও 'মালসী' বলে উল্লেখ করেছেন। 'সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থে দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে গেয় গানকে 'মালসী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দুর্গার অপর নাম 'আগমনী' - এই হেতু কচিৎ কেউ যাবতীয় শাক্ত সঙ্গীতকেই 'আগমনী' আখ্যা দিতে চান — যদিও এজাতীয় গানের একটি বিশেষ অংশের নামই শুধু 'আগমনী' বলে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে।

একালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত শক্তি তথা দেবী-বিষয়ক গানের সঙ্কলন 'শাক্ত পদাবলীর' নামে অভিহিত হওয়ায় এই নামটিই বিশেষভারে প্রচলিত।

শাক্ত পদাবলীর বিষয় প্রধানত শক্তি হলেও তার দুটি বিশেষ রূপকেই কবিরা নির্বাচন ক 'রে নিয়েছেন এবং সেই হিসেবে শাক্ত পদাবলীর দুটি ধারাই প্রধান। একটি ধারার বিষয় 'উমা / পার্বতী' এবং অপর ধারায় কালী / শ্যামা।

উমা-বিষয়ক গানগুলি 'উমাসঙ্গীত' বা 'আগমনী' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত হলেও এর অংশবিশেষকে 'বিজয়া' নামেও অভিহিত করা হয়। এই সঙ্গীতের প্রধান রস 'বাৎসল্য'—মা মেনকা স্বামীগৃহবাসিনী উমার জন্য আকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি তার স্বামী হিমালয়কে পাঠিয়েছেন উমাঝে পিতৃগৃহে নিয়ে আসবার জন্য পিতা হিমালয় তিনদিনের জন্য উমাকে নিয়ে এসেছেন ; উমা শারদ সপ্তমী অষ্টমী-নবমী এই তিন দিন পিতৃগৃহে রইলেন ; দশমী প্রভাতে মহাদেব নিজে এসে উমাকে নিয়ে গেলেন —মোটামুটি এই কাহিনীকে অবলম্বন ক 'রে মা মেনকার-হাদয়ে বাৎসল্য রসের যে বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখা দেয় , তাকেই সাধারণত 'উমা সঙ্গীত' বা ''আগমনী বিজয়া' নামে অভিহিত করা হয়। এই উমাসঙ্গীতের সঙ্গে বাঙালী পারিবারিক জীবনের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাঙালী ঘরের কন্যা মাত্রেই যেন উমা। পতিগৃহবাসিনী কন্যাই বাঙালী মায়ের মনে উমার স্থান অধিকার করে। দুর্গাপূজার কিছুকাল থেকে বিজয়া পর্যন্ত এই সঙ্গীতের প্রচলন কাল। রামপ্রসাদ ছাড়াও অনেক কবি উমাসঙ্গীত রচনা করেছেন।

কন্যারূপিণী শক্তি ছাড়াও বাঙালী শক্তি-সাধকের চিত্ত জুড়ে রয়েছেন মাতৃরূপিণী শক্তি — তিনি সাধারণত 'কালী' বা 'শ্যামা' রূপেই পরিচিতা। এঁকে অবলম্বন ক 'রে যে পদগুলি রচিত হয়েছে , তাকে বলা হয় 'শ্যামাসঙ্গীত' বা 'কালীকীর্তন'। এখানে প্রধান রস ‘প্রতিবাৎসল্য’ বা ‘মাতৃভক্তি’। উমা সঙ্গীতে জগজ্জননীর মধুর ভাবের ও মাধুর্যরসের প্রাধান্য, শ্যামাসঙ্গীতে প্রাধান্য ভঙ্গি ভাবের ও ঐশ্বর্যরসের। এ জাতীয় সঙ্গীতে যেমন জগজ্জননীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আছে বিভিন্ন তত্ত্বকথা , তেমনি এতে প্রকাশ পেয়েছে ভক্তের আকৃতিও আবার কোনো কোনো পদে নানারকম সামাজিক সমস্যারও পরিচয় পাওয়া যায়। উমাসঙ্গীতে যেমন সহজ সরল ভাষায় হাদয়-বেদনা প্রকাশিত হয়েছে, শ্যামাসঙ্গীতে তেমন নয়। উমাসঙ্গীতে পারিবারিক জীবনের অনুপুঙ্গ পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, শ্যামাসঙ্গীতে তেমনি পাওয়া যায় সামাজিক জীবনের পরিচয়, এগুলিতে ভাষার ঐশ্বর্য এবং অলঙ্কারের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব কবিতার আদর্শে রচিত বলেই কোনো কোনো শাক্ত পদাবলীতে বৈষ্ণব পদের মতোই বাল্যলীলা , গোষ্ঠ, রাস আদিও বর্ণিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও একটি কথা স্বীকার করতে হয় যে , শাক্তপদে ধরণীর ধূলিমাখা জীবনের প্রতি যে গভীর মমত্ববোধ রয়েছে, তেমনটি সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও এমনকি বৈষ্ণব পদাবলীতেও নয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশেষ সৃষ্টি এই শাক্ত পদাবলী। মধ্যযুগের সমাপ্তিমুখে শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব , এদের বিকাশ ঘটেছে সেই ক্রান্তিকালে–সে যুগটিকে আমরা বলি আলো আঁধারির যুগ, ভাঙা-গড়ার যুগ বা অবক্ষয়ের যুগ। এই ধারা এগিয়ে এসেছে একালেও অর্থাৎ আধুনিক যুগেও। সম্ভবত এই কারণেই মধ্যযুগের বাবতীয় সাহিত্যের তুলনায় শাক্ত পদাবলীর অবস্থান আমাদের হৃদয়ের অনেক বেশি কাছে।

নানা কারণেই শাক্ত পদাবলী কতকগুলি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। সাধারণভাবে এগুলিকে গীতিকবিতা বলেই আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে গীতিকবিতাগুলি সুরবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন সুখপাঠ্য কিংবা বৈষ্ণব

কবিতা থেকে সুর বর্জন করলেও যেমন রসানুভূতিতে পাঠকের মন বিমুগ্ধ হয় , শাক্ত পদাবলীর এতখানি ক্ষমতা নেই এটি তার বিশেষ দুর্বলতা। প্রায় সর্বত্র শাক্ত পদাবলীতে তত্ত্বের উপস্থিতি বর্তমান থাকে , তা ছাড়া একটি বিশেষ সুরের সঙ্গে এই পদাবলীগুলি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে সাধারণ আবৃত্তিতে পাঠকের মন পূর্ণ হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এগুলিকে কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছাস ঘটেছে বলেই এগুলিকে গীতিকবিতা বলে মেনে নিতে হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন ক 'রেই শাক্ত পদাবলীর সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে ধর্ম-সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন ক 'রে পাঠ করলেও এদের আবেদন বিঘ্নিত হয় না।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন , "বৈষ্ণব পদাবলী গোষ্ঠীগত প্রেমবিশ্বাসের ভক্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। তাই , এই পদসাহিত্যে ধর্ম ও ধর্মানুরাগ সমসুত্রে বিধৃত, একে অন্য থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু শাক্তসঙ্গীতের মর্মোৎসারিতা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি-চিত্ত প্রবাহে সমাকুল। এইখানেই এই দুই শ্রেণীর ধর্মনির্ভর গীতিসাহিত্যের ঐতিহাসিক পার্থক্যমূল। " শাক্ত পদাবলী একান্তভাবে জীবনাশ্রয়ী। সমাজ সংসারকে কেন্দ্র করেই চলেছে এদের আবর্তন , সমাজ-জীবন এবং ব্যক্তিজীবনের রূপ এগুলিতে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। মানবিক আবেদনে পুষ্ট এবং জীবনরসে অভিষিক্ত এই পদগুলিতে বাঙালী গৃহস্থজীবনের যে অকৃত্রিম চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে , প্রাগাধুনিক যুগের কোনো সাহিত্যেই এর তুলনা মিলবে না। এইদিক থেকে বাংলো সাহিত্যের ইতিহাসে শাক্ত পদাবলীর স্থান একক ও অনন্য।

শাক্ত পদাবলীতে ঘটেছে তত্ত্ব ও লীলার সমন্বয় , মাধুর্য ও ঐশ্বর্যরসের সমন্বয় এবং তার চেয়েও বড় কথা ,— এক পরম উদার মনোভাবের ফলে এতে বিভিন্ন ধর্মমতেরও সমন্বয় - ঘটেছে বলে সাধক কবির দৃষ্টিতে 'শ্যাম' ও 'শ্যামা' একাকার হয়ে গেছে। বস্তুত বহু বিচিত্রতার মধ্যে সমন্বয় সাধনই যেন শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্য এ জাতীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিই আনন্দানুভব ক 'রে থাকেন। অধিকন্তু এখন শাক্ত পদাবলীতেই যেন শোনা যায় গীতার সার–কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সুর।

রামপ্রসাদের কবিকৃতিত্ব

শাক্ত পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্ম ও মাতৃরসে জারিত এক উল্লেখযোগ্য কাব্যধারা। কোনও কাব্য সৃষ্টি স্বয়ম্ভু সাধনার ফল নয়। উৎপত্তিস্থল একটা থাকেই। সেই উৎসস্থল কবিদের প্রেরণারস্থল হয়, কবিকে প্রভাবিত করে। বৈষ্ণব পদাবলীই শাক্ত পদাবলীর উৎসকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেছেন। আবার কোন সৃষ্টি দেশ, কাল, সমাজব্যবস্থার ঊর্ধ্বে নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একদিকে বর্গীর হাঙ্গামা, শাসকদের অত্যাচারে বাঙালীর ধর্ম, প্রাণ সব কিছুতেই একটা নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়।

এরকমই এক জরাতুর কালে সাধক কবি রামপ্রসাদ এসেছিলেন তাঁর সাধনার অনুভূতিলব্ধ সুর ও ধ্বনি নিয়ে। তাঁর বাণীতে ক্লান্ত, অবসন্ন বাঙালী-জীবন মায়ের রক্তচরণ কমলে বিপদ মুক্তির শরণাগতি খুঁজেছে। সন্তানের আতুর ব্যাকুলতা মায়ের প্রতি দুহাত বাড়ানো স্নেহ প্রার্থনা রামপ্রসাদের ভবঘুরে জীবনের মহত্তর সাফল্য।

শ্রমে ও সেবায়, বৈরাগ্যে ও ব্যর্থতায়, প্রার্থনায় ও বার্ধক্যে, স্নেহবুভুক্ষার কম্পিত মুহূর্তে কিংবা ভক্তির আকণ্ঠ ক্রন্দনে নৈসর্গিক আবেগের বাণীরূপ রামপ্রসাদের পদাবলী। তাই বাঙালীর অতি কাছের মাটির গন্ধমাখা জীবন প্রসাদী সুরের মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিক সংস্কৃতির যুগেও অতি সহজে প্রবেশ করে আমাদের বাতায়ন পাশ দিয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তিমানের হঠকারী শাসনে, অদৃষ্ট রাজার নামে রাজপুরুষের ঘৃণ্য অত্যাচারের ফলে নাগরিকতায় অনপুযুক্ত গ্রাম্য মানুষগুলি বাধ্য হয়ে নগরের দিকে চালিত হল। নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্য যদি পুরুষানুক্রমে কৃষিজীবী জমি থেকে উৎক্ষিপ্ত করে প্রবাসে মুহুরিগিরির বৈষয়িক জটিলতায় নিয়োজিত করে, সেই বিষয়ান্তরিত জীবনের ব্যর্থতা তার স্বভাব-সংগত চিত্রকল্পেই আত্মপ্রকাশ করে। রামপ্রসাদের পদে হয়ত তাই ঘটেছে।

"মনরে কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব-জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।"

অকর্ষিত মানবজীবনকে আধ্যাত্মিকতারূপ কৃষিকর্মের দ্বারা শস্যসম্ভব করার পিছনে কৃষিকর্মের ব্যর্থতা জনিত আক্ষেপটি একান্তই জীবিকা বঞ্চনার নিষ্ফলতা থেকে প্রক্ষিত হয়েছে।

আগমনী বিজয়ার গানে রামপ্রসাদের প্রতিভা অল্প প্রকাশিত। কিন্তু এই পদগুলিতে যে বাৎসল্যরসের প্রকাশ ঘটেছে তা চমৎকার। মেনকা কন্যাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখে সিদ্ধান্ত করেছে-

"এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।"

দীর্ঘ অদর্শন পর মাতা-কন্যার মিলন মুহুর্তটি বর্ণনায় রামপ্রসাদ অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন-

"উমা কোলে বসাইয়া চারুমুখ নিরখিয়া
চুম্বে অরুণ অধর।"

কিন্তু বিজয়ার দিনে উমাকে মহাকালের হাতে তুলে দিতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত মায়ের অবুঝ মন বলে ওঠে-

"তনয়া পরের ধন না বুঝিয়া বুঝে মন
হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার।"

জীবন যে এত সহজ অনাড়ম্বর অথচ মর্মস্পর্শী ভাষায়, ছন্দে, সুরে প্রকাশিত হতে পারে প্রসাদী গানের অবির্ভাব না হলে বাংলা সাহিত্য তা জানতেই পারত না।

তবুও সাধক কবি রামপ্রসাদ শ্রেষ্ঠ তাঁর সাধনাশ্রয়ী পদগুলোর জন্য। **রামপ্রসাদ তন্ত্রসাধক।** সাধারণ তন্ত্র সাধনায় সুকোমল হৃদয়বৃত্তি নেই; আছে কঠোর তপস্বা, তীব্র কৃচ্ছ্রতা। রামপ্রসাদ এই সকল তান্ত্রিক আচরাদির মধ্যেও, যে মা ব্রহ্মাণ্ডের পালয়িত্রী, এই সমগ্র বিশ্ব যাঁর চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার ভগ্নাংশ, সেই অনির্বচনীয় শক্তিকে সন্তানের অসীম করুণায় আপনার ভগ্ন গৃহভিত্তির সংলগ্ন বেড়া বাঁধার কাজে নিয়োগ করেছেন, পরমাত্মরূপিণী আদিভূতা সনাতনীকে পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সংস্থাপিত করেছেন।

এগুলি কবির মৌলিকতার স্বাক্ষরবাহী। রামপ্রসাদ জগজ্জননীর চরণে কেবল সাধনার জবাপুষ্প অর্পণ করেননি, বেদনার রসে বাৎসল্যের তর্পণ করেছেন। মায়ের প্রতি রামপ্রসাদের অভিযোগ তাই বাহ্যিক। তার অন্তর্নিহিত মাতৃনির্ভরতাই সবচেয়ে বড় কথা। জীবনে দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করে তাই তিনি বলেছেন-

"মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো
ওমা মিঠার লোভে তিতমুখে সারাদিনটা গেল।"

কলুর তৈলনিষ্কাষণ যন্ত্রের চারপাশে অন্ধ বলদের রাত্রিদিন চক্রাবর্তনের উপমায় এই প্রাণধারণের গ্লানি **রামপ্রসাদের** পদে সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়েছে-

"ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত।"

তবুও মাতৃচরণের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে। অন্ধবৎ জীবনযাপনের যান্ত্রিক তাড়নায় তাই তাঁর একটিমাত্র সাধ-

"একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি
দেখি শ্রীপদ মনের মতো।"

সংসার জ্বালায় অশ্রুপাত শেষ করে, তারা নামের পুলকে গলদশ্রু হয়ে তাই কবি এবার বলেছেন-

“রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো।”

বৈষ্ণবীয় গানে প্রেমভক্তির যে ধারা, বাৎসল্য রসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে উগ্র তপস্বা আর মন্ত্রতন্ত্রের আয়োজন থেকে মানুষের মনকে মুক্তি দিয়ে জীবনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। রামপ্রসাদের মৃত্তিকাগন্ধী এই গানগুলিতে সেই একই ধারার অনুরণন।

রামপ্রসাদের কবিভাষা সাদামাটা কথায় তাঁর পদে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আদ্যাশক্তি শ্যামার সঙ্গে তাঁর মা-ছেলের সম্পর্ক। রামপ্রসাদের রচিত পদগুলি, অষ্টাদশ শতাব্দীর হতাশার জড়িমায় আচ্ছন্ন মানুষের বড় সান্ত্বনার স্থল, বাস্তব দুঃখের একমাত্র প্রতিষেধক। রামপ্রসাদের ক্রন্দনের তীব্রতায় অসহায়তার উৎকণ্ঠ বিলাপ, কেবল নিশ্চিন্ত উদাসীন মাতাকে বিচলিত করে তাঁর অবশ্যপ্রদায়ী কৃপালাভের জন্য।

শ্যামার সন্তান রামপ্রসাদ আধ্যাত্ম সাধনার বাস্তবতা ও কাব্যরসের ত্রিবেণী রচনা করে ভক্তিরসাশ্রিত গীতিসাহিত্যকে সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। অথচ তাঁর কাব্যের ছন্দ মধ্যযুগের বিলম্বিত তানপ্রধান ছেড়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব স্বরবৃত্তে প্রকাশিত। **রামপ্রসাদ** অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অনাগতকালের সমুদ্র-কল্লোল শুনতে পেয়েছেন।

তাই তিনি দেবতা ও মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। **“মা আমায় ঘুরাবি কত”**-বাংলা গীতিকবিতার এখানে প্রথম অস্ফুট ঊষারাগ। এই প্রথম কবিকণ্ঠ এক সম্প্রদায় নিরপেক্ষ নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বকে দেবতার সামনে নিয়ে এলেন। যেখানে লোকায়ত মানবতাবাদ অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত গোত্রহীন ভক্তির নতুন সুর, নতুন কবিভাষার জন্ম দিচ্ছে। তাই প্রসাদী সঙ্গীতে বাংলা সাহিত্যের **আধুনিক যুগের অঙ্কুরোদ্গম।**

অবশেষে বলা যায় বিষয়বিকার ও গার্হ্যস্থ বেদনার মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও সূর্যমুখীর মত হৃদয়ের অতন্দ্র সাধনাকে যে ঊর্ধ্বচারী করে রাখা যায়, জীবনের সকল লাঞ্ছনা-বেদনার মধ্যেও মাতৃচরণের প্রতি প্রাণের সকল চাঞ্চল্যকে স্তবীকৃত করা যায়, গৃহী সংসারী আসক্ত মানুষের প্রতি এই শিক্ষাই রামপ্রসাদের কবিরূপে জনপ্রিয়তার মূলে।

শাক্ত পদাবলীর কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের কবিকৃতিত্ব

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বেশ কয়েকজন শাক্ত পদকার পদ রচনা করে শাক্ত গীতি সাহিত্য ও শাক্ত সাধনাকে জনপ্রিয় করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সর্বাতিশায়ী বৈবপ্রভাব , বিশেষত বৈষ্ণুব গুরুবাদ ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের রহস্যময় রসের সাধনার প্রতিষেধক হিসাবেও অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ সমাজে ও অভিজাত সমাজে

শাক্ত পদচর্চার বিশেষ বাহুল্য দেখা যায়। পূর্বে দেখেছি , ষোড়শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য উৎপীড়িত জনচিত্তে সর্বশক্তিময়ী মঙ্গলকাব্যের দেবীদের পরিকল্পনা হয়েছিল। তাঁদের মহিমা জ্ঞাপক পুরাণধর্মী কাহিনি-কাব্যও রচিত হয়েছিল। সেই উপদ্রুত রাজনৈতিক জীবনে দেবীর বরাভয় জনচিত্তকে সঙ্কট মুহূর্তে আত্মরক্ষা করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি হতে বাংলাদেশে আবার রাষ্ট্র সংকট মাথা তুলল। রাষ্ট্রের শোষণ যন্ত্রে ধনী দরিদ্র , রায়ত-জমিদার, প্রজা-ভূস্বামী সকলেই সমবেতভাবে পিষ্ট হতে থাকল। সেই বাস্তব যন্ত্রণা ভুলে মানসিক মুক্তির উদার আসনে শ্যামামায়ের স্নেহাঞ্চলে অসংখ্য ভক্তের দল মিলিত হলেন। এর মধ্যে একনিষ্ঠ ভক্ত এবং পদকার হিসাবে কমলাকান্তের নাম সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণযোগ্য।

বাংলা শাক্ত পদসাহিত্যে যিনি কবি ও সাধক রামপ্রসাদের তুল্য গৌরব লাভ করেছিলেন , তিনি হলেন এই কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)। রামপ্রসাদের মতোই তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক গল্প প্র লিত হয়েছিল। সাধন মার্গেও তিনি রামপ্রসাদের মতো সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অবশ্য কবিরঞ্জনের অধিকতর জনপ্রিয়তার ফলে কমলাকান্তের খ্যাতি কিছু সংকুচিত হয়েছিল। যদিও তাঁর অনেক শাক্ত পদ কাব্যগুণে রামপ্রসাদ অপেক্ষা কোন দিক দিয়ে ন্যূন নয়। বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে তাঁর তিরোধানের পর বর্ধমানের রাজের উদ্যোশে জীবনীসহ তাঁর সমগ্র পদাবলী মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯২০ সালে কমলাকান্তের জীবনীকার অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর লেখায় কবির জন্মস্থান , জীবনকথা ও সাধন স্থান সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় , তাতেই সহজেই অনুমেয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। আবার জীবিতকালে মহাসাধক বলে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তের যে জনিপ্রয়তা তা মূলত তাঁর শাক্তপদাবলীর জন্যেই। বর্ধমান রাজবাটী-প্রকাশিত কমলাকান্তের পদাবলী সংগ্রহে মোট ২৬৯ টি পদছিল। তার মধ্যে ২৪৫টি ছিল শ্যাম বিষয়ক , ২৪টি বৈব ভাবাপন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ। কবি যে প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের অনুরক্ত ছিলেন তাঁর সাধকরঞ্জন গ্রন্থটি পাঠ করলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কবি এই বৈষ্ণুব ভাবের রসে অনেকগুলি বৈশব পদ রচনা করলেও অধিকাংশ বৈষ্ণব পদই কবিত্ব বর্জিত, শুধু গৌর চন্দ্রিকার পদে কিঞ্চিৎ প্রতিভার পরিচয় মেলে। যাইহোক , কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশত শাক্তপদ পাওয়া যায় , তার মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার গান অতি উৎকৃষ্ট , তাতে মাতৃহৃদয়ে বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা কবি খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। সাধক রাম প্রসাদ শাক্ত পদ রচনায় খ্যাতির শীর্ষ স্থানে অবস্থান করলেও কমলাকান্তের মতো আগমনী বিজয়ার পদ রচনায় সফল হননি।

প্রতিটি বাঙালি বৎসরে একবার দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে নানা আনন্দে মেতে ওঠেন। তাঁদের ধারণা , বৎসরে একবার ঘরের কন্যা উমা পিত্রালয়ে অর্থাৎ কৈলাস ভবনে আসেন , মাতা মেনকা শোক তাপ জর্জর চিত্তে কন্যা উমাকে কাছে পেয়ে চারদিনের জন্যে আনন্দের সাগরে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। চারিদিকে হাসি আর খুশীর লহরী, পাড়া পড়শীরা ছুটে আসে কন্যা উমাকে দেখতে, বিয়ে হওয়ার পর উমা কেমন আছে, তা জানতে। তবে এ শুধু উমাকে

কেন্দ্র করে একটি মাত্র কল্পিত চিত্র হয়েই থেমে থাকেনি। বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনে বাবা মায়েরা যে সব কন্যাদের পাত্রস্থ করেছিলেন এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে শ্বশুর বাড়ী থেকে সেই সব কন্যাদের পিত্রালয়ে আনতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। সব মিলিয়ে দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালির প্রতি ঘরে ঘরে এই পূজার কয়দিন সুখের চিত্র বিরাজ করতে থাকে। তবে স্মরণ রাখতে হবে বৎসরান্তে ঘরে কন্যা উমা যে একবার পিত্রালয়ে আসে তার জন্য সারা বৎসর ধরে মাতা মেনকা কন্যার জন্য কম অনুতাপ সহ্য করেননি। মাতার এই তাপ জর্জর হৃদয়ের অভিব্যক্তির সন্ধান পদকার কমলাকান্ত খুব নিপুণ ও সুচারুভাবে তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর এখানেই কমলাকান্তের শ্রেষ্ঠত্ব।

দীর্ঘ অদর্শনে কন্যার জন্য মাতার হৃদয় বড়ো ব্যাকুল। মেনকা স্বপ্নে উমাকে দেখে গিরিরাজকে বলেন—

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।...
এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথায় গেল
হে, আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে।।

স্বপ্নে কন্যাকে দেখে মাতা বড়ো অস্থির হয়ে পড়েছেন। আর বিলম্ব নয় এখনি কৈলাস পতিকে বলে মেয়েকে ঘরে আনার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু উদাসীন স্বামীর প্রতি অনুযোগ করে মেনকা বলেন—

কবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীত্ব আনিতে।
ব্যাকুল হইয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।।

এ বাক্যে স্বামীকে একেবারে নীরবতা পালন করতে দেখে প্রায় আতকণ্ঠে মেনকা অভিযোগ হানে—

গৌরী দিয়ে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছো ঘরে
কি আছে অন্তরে তব বুঝিতে না পারে।
কামিনী করিল বিধি তেই হে তোমারে সাধি
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।”

এই ভর্ৎসনার পর পিতা হয়ে গিরিরাজ কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন ? তাই তিনি অবিলম্বে কৈলাসে গিয়ে কন্যাকে এনে গিরিরাণীর কোলে অর্পণ করে বলেন—

“গিরিরাণী এই নাও তোমার উমারে
ধর ধর হরের জীবন ধন।।”

সহসা কন্যাকে সশরীরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার পর মায়ের হৃদয়ের বাৎসল্যের বাঁধ ভেঙে গেল। দেবীকে কোলে নিয়ে মা মেনকা বলে ওঠেন—

“ভাল হল এলে তুমি আর না পাঠাব আমি
বুঝি বিধি প্রসন্ন হৈল গো।”

কিন্তু উমাকে তিনি কয়দিনই বা ধরে রাখতে পারবেন ? নবমী নিশি অবসান হলেই তো ভোলা মহেশ্বর এসে গৌরীকে আবার কৈলাসে নিয়ে যাবেন। তাই রাণী আকুল প্রার্থনা জানান —“ওরে নবমী নিশি , না হৈও রে অবসান।” কিন্তু সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করে না, নবমী নিশিরও অবসান হয়। ভোলানাথের ডমরু বেজে ওঠে। তাছাড়া উমার তো থাকবার উপায় নেই। তাঁকে তো হিমাচল গৃহ আঁধার করে কৈলাসে যেতেই হবে। তাই মাতা মেনকার শুধু বিলাপই সম্বল হয়—

“ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো ।”

এ সমস্ত থেকে বুঝতে বিলম্ব হয় না, শাক্ত পদ রচনায় কমলাকান্তের কৃতিত্ব কতখানি। তবে আগমনী বিজয়ার এই সব পদে বিশেষ কোন কাব্যগুণ না থাকলেও আন্তরিকতা অকৃত্রিম আবেগের জন্য এগুলি এখনো বাংলাদেশে জনপ্রিয়।

কমলাকান্তের কয়েকটি শ্যামা সঙ্গীত শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর কোন কোন পদ কবিত্বের দিক দিয়ে রামপ্রসাদ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আবেগ , শিল্পরূপ তাত্ত্বিকতা প্রভৃতি গুণগুলিকে তিনি কয়েকটি পদে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেমন—

- (ক) সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমহিনী গো মা।
- (খ) তাই শ্যামা রূপ ভালোবাসি, কালী মনোমহিনী এলোকেশী।
- (গ) শুকনো তরু মঞ্জুরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে।

এসকল পদের সাধ্য সাধন গত গুঢ়ার্থ যাই হোক না কেন , কিন্তু পংক্তি কটির নিখুঁত ছন্দ , প্রতীক প্রভৃতি আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। কিংবা,

- (ক) আদর করে হৃদে রাখ আদরিনী শ্যামা মাকে।
- (খ) আপনারে আপনি দেখ যেও না মন কারু ঘরে।
- (গ) মন গরীবের কি দোষ আছে, তার কেন নিন্দা কর মিছে।

এই সমস্ত পদের মার্জিত সংযত ভাষাভঙ্গির মধ্য দিয়ে কবি যে সমস্ত তত্ত্বকথা বলেছেন, তার গূঢ় তাৎপর্য সাধকের কাছে পরম আদরের বস্তু, কিন্তু সাধারণ রসিক পাঠকের নিকট এর কাব্যমূল্য অল্প নয়।

তাই বলা যায়, বাংলা শাক্ত সাহিত্যে বহু সাধক , ভক্ত ও কবির আবির্ভাব হয়েছে , তাঁদের রচিত শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু কমলাকান্ত এই বিপুল আয়তন পদসাহিত্যের মধ্যেও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। রামপ্রসাদের কবিত্ব ও সাধকত্ব এক সূত্রে মিলে গিয়েছে , তাই তাঁর বাণী মূর্তি অনেক সময় নিরাভরণ চলতি গ্রাম জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কমলাকান্তের পদে সচেতন রচনা শক্তির মার্জিত বাকরীতি অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। রামপ্রসাদের গান সুরের আশ্রয় না পেলে যেন দাঁড়াতে পারে না , কিন্তু কমলাকান্তের গানের অনেক স্থানে বিশুদ্ধ লিরিক রূপটি রক্ষিত হয়েছে— তাঁর পদ গান না করলেও চলে, শুধু পাঠে বা আবৃত্তিতে এর রস ধরা পড়ে। তাই সমালোচক ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে হয় *"ভবিষ্যতে বাঙালির মনোভঙ্গীর কোন উৎকট পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে কমলাকান্ত যে স্বমহিমায় চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।"*